

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড

মূল : তামিম আনসারী

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

প্রকাশকের কথা

একজন পাঠক হিসেবে মুসলমানদের ইতিহাসের বই পড়তে গিয়ে কিছু ব্যাপারে অতৃপ্তি অনুভব করেছি। আমাদের ইতিহাসের বইগুলো তারিখ, সাল, নাম, স্থান-কালসহ বেশ তথ্যে ভরপুর, কিন্তু সেখানে সাহিত্যমানের নিদারুণ অনুপস্থিতি। ইতিহাসের পাঠ কেমন যেন নিরস বর্ণনানির্ভর। পাঠকদের কাছে ইতিহাসের বয়ান মজাদার করে উপস্থাপন করাটা সত্যিকার অর্থেই বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ। আমি এমন একটা সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ ইতিহাসের বই খুঁজেছি, যা পড়ে একজন পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন, প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব করতে পারবেন। ইতিহাস পড়তে গিয়ে কেউ ক্লান্ত হবে না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ইতিহাসের বইগুলোতে বর্ণনার ধারাবাহিকতার বেশ ছন্দপতন দেখেছি। বইগুলোতে ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা নেই। আবার এমন কিছু গ্রন্থ আছে, যেখানে অনেক তথ্য ও বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে থাকলেও আকারে অনেক বড়ো কিংবা কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এমন একটি গ্রন্থ খুঁজেছি, যেখানে মুসলমানদের পুরো ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার আছে। মাত্র একটি বইয়েই আমাদের প্রয়োজনীয় ইতিহাস সংকলিত আকারে দেখতে চেয়েছি।

সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে একদিন জিয়া হাসান ভাইয়ের *Destiny Disrupted : A History of the World Through Islamic Eyes* বইয়ের ওপর করা ভিডিও রিভিউ দেখছিলাম। সেখান থেকে উৎসুক হয়ে বইটির পিডিএফ পড়েই পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। এমন একটা বই-ই তো আমি খুঁজছি! জিয়া হাসান ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, উনি ভিডিও রিভিউ না করলে সম্ভবত দারুণ এই বইটি আমার নজরেই আসত না। আলী আহমাদ মাবরুর ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মন্ত্রীপুত্র এতটা সাধারণ আর বিনয়ী হতে পারে, মাবরুর ভাইকে না দেখলে তা উপলব্ধি করতে পারতাম না। মাত্র পাঁচ মাসেই এত বড়ো বইটির প্রাঞ্জল অনুবাদ করে দিয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাদকের প্রথম অনূদিত বই হলেও পুরো বই জুড়ে পাঠক বেশ প্রাঞ্জলতা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আলোচিত এই বইটি ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর তুমুল পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই মাঝে একটা বড়ো ভুল দৃষ্টিগোচর হয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলে বইটির সর্বশেষ সম্পাদিত কপির পরিবর্তে অসম্পাদিত কপি ছাপাখানায় চলে যায়। যার কারণে কিছু তথ্যগত বিভ্রাটের সাথে পুরো সতেরো নম্বর অধ্যায়টি বাদ পড়ে যায়। আমরা দীর্ঘ পাঁচ মাসব্যাপী বইটির সম্পাদনা করেছি, তথ্যবিভ্রাট দূর করার চেষ্টা করেছি। এরপরেও কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে

পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। বইটিকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটিমুক্ত করার স্বার্থে সম্পাদনার সময়ক্ষেপণের কারণে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। সম্মানিত পাঠকদের কাছে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বইটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সম্মানিত পাঠকদের পজেটিভ-নেগেটিভ ফিডব্যাক পেয়েছি। প্রত্যেকটি ফিডব্যাক আমলে নিয়ে আমরা নতুন করে কাজ করেছি। এতটুকু জানিয়ে রাখা জরুরি মনে করছি যে- লেখক এখানে প্রত্যেকটি চিন্তা-কাঠামোর বক্তব্য ও তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার স্ব স্ব বয়ান থেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। বইটির মূল ফোকাস- কীভাবে মুসলমানরা ধীরে ধীরে ডেসটিনি থেকে বিচ্যুত হলো। এই বইয়ে ইতিহাসের বয়ানগুলোকে প্রমাণ করার পরিবর্তে গল্পের মতো করে পাঠকদের সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রেফারেন্স-এর পরিবর্তে প্রচলিত ধারণার কেবলমাত্র বর্ণনা রয়েছে। শুদ্ধ কিংবা ভুল- এসব বয়ান পৃথিবীতে জারি ছিল বলেই মুসলমানরা সামষ্টিকভাবে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রাণসত্তার দাবি থেকে সরে গেছে। যার ফলে বীরের জাতি আজ খুব কঠিন সময়ের মুখোমুখি। মুসলমানরা ঠিক কোন কোন পয়েন্টে এসে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল, তা এখানে আলোচিত হয়েছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ বইটি পড়ার সময় এই কথাগুলো বিবেচনায় রাখবেন।

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড : ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস বইটি একটা ছোটো মানের ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়া। এতে রাসূল ﷺ-এর হিজরত থেকে শুরু করে ২০০১ সালে আমেরিকায় টুইন টাওয়ার হামলা পর্যন্ত সময়ের এক ধারাবাহিক আলোচনা থাকছে। তামিম আনসারির এই বইটি পড়ে ইসলামের চোখ দিয়ে পুরো দুনিয়াকে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। বইটি পড়ার পর ইতিহাসের খুঁটিনাটি আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে আপনার আগ্রহ জন্মাবে নিশ্চয়।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূচিপত্র

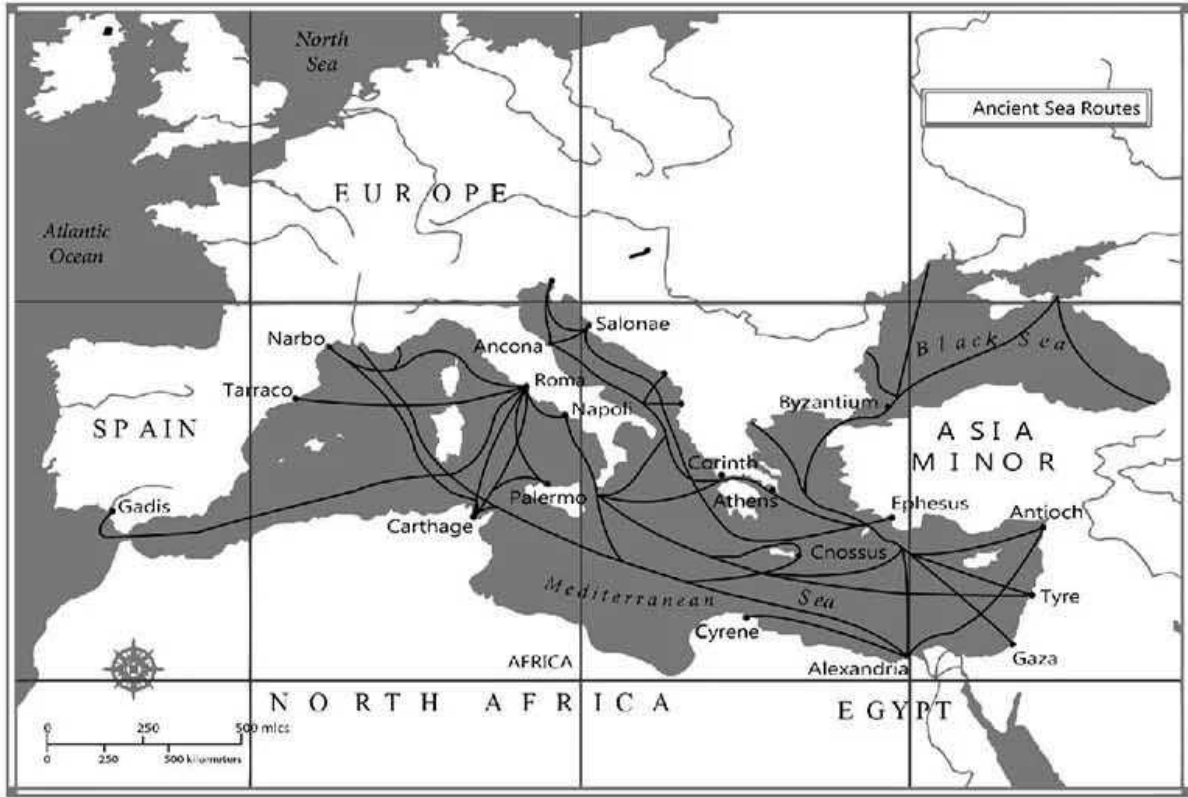
১.	মধ্য পৃথিবী (দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড)	২৯
২.	দ্য হিজরা (শূন্য বছর বা ইয়ার জিরো) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	৪৮
৩.	খেলাফতের জন্ম হিজরি ১১-২৪ বা ৬৩২-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ	৬৭
৪.	বিভেদ-বিভাজন (২৪-৪০ হিজরি) ৬৪৪-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ তৃতীয় খলিফা (২২-৩৬ হিজরি, ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)	৯৪
৫.	উমাইয়া সাম্রাজ্য (৪০-১২০ হিজরি) ৬৬১-৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ	১১২
৬.	আব্বাসি যুগ (১২০-৩৫০ হিজরি) ৭৩৭-৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ	১২৭
৭.	জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ (১০-৫০৫ হিজরি) ৬৩২-১১১১ খ্রিষ্টাব্দ	১৩৯
৮.	তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান (১২০-৪৮৭ হিজরি) ৭৩৭-১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	১৬৯
৯.	ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য (৪৭৪-৭৮৩ হিজরি) ১০৮১-১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ	১৮৮
১০.	পুনরুত্থান (৬৬১-১০০৮ হিজরি) ১২৬৩-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ	১১১
১১.	ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা (৬৮৯-১০০৮ হিজরি) ১২৯১-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ	২৭০
১২.	পাশ্চাত্যের প্রাচ্যমুখী অভিযান (৯০৫-১২৬৬ হিজরি) ১৫০০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ	২৯২
১৩.	সংস্কার আন্দোলন (১১৫০-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৩৭-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ	৩২৯
১৪.	শিল্প, সংবিধান ও জাতীয়তাবাদ (১১৬৩-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৫০-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ	৩৫৫
১৫.	ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থীদের উত্থান (১৩৩৬-১৩৫৭ হিজরি) ১৯১৮-১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ	৩৯১
১৬.	আধুনিকতার সংকট (১৩৫৭-১৩৮৫ হিজরি) ১৯৩৯-১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ	৪১১
	পরিশিষ্ট	৪২৬

১ মধ্য পৃথিবী

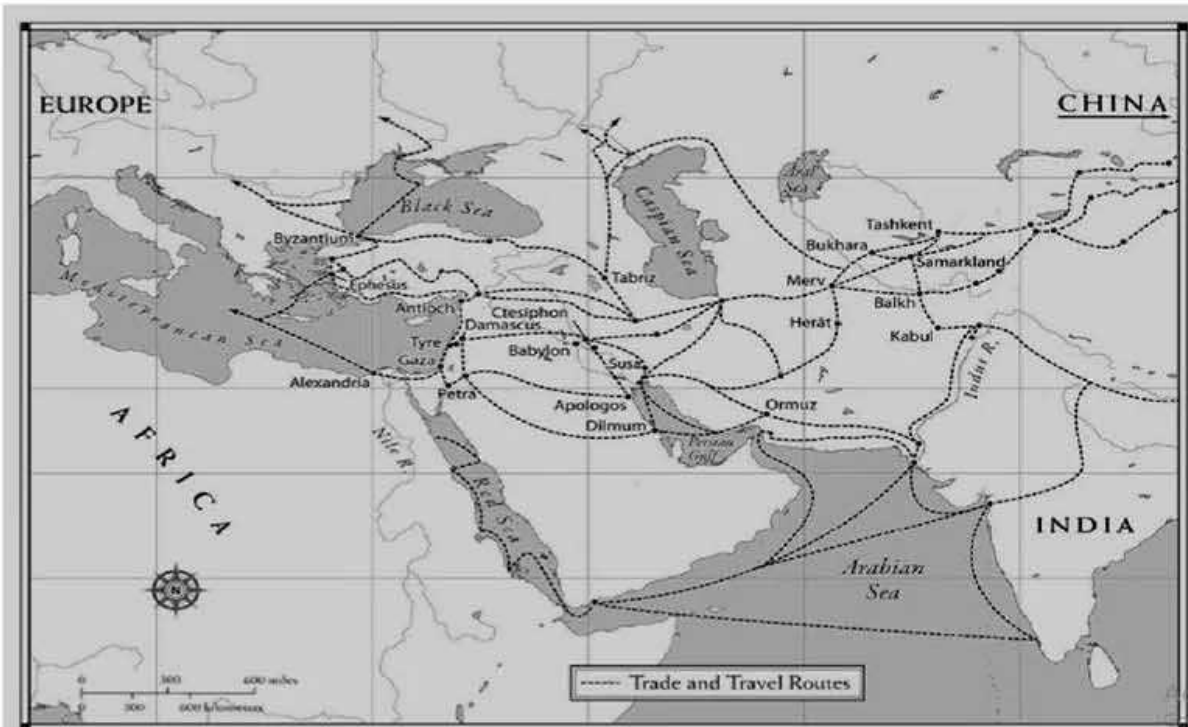
মানবতার বন্ধু প্রিয় নবিজি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের বার্তা নিয়ে এই পৃথিবীতে আসার বহু আগেই তৎকালীন পৃথিবীতে দুটো ভিন্ন ধরনের পৃথিবী (দুটো বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য, যা কাঠামোগত ও চেতনাগত দিক থেকে এতটাই আলাদা যেন দুটো দুই ভিন্ন পৃথিবী) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আটলান্টিক মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী অববাহিকায় এই দুই পৃথিবীর অবস্থান। দুটো ভিন্ন ধারার পৃথিবীর ভ্রমণ ও বাণিজ্যপথগুলোও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এক পৃথিবীতে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল মূলত সমুদ্রপথ আর অন্যটি ছিল স্থলপথ।

যদি আপনি প্রাচীন সময়ের সমুদ্রপথটি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখবেন বাস্তবিক অর্থে বিশ্ব ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভূমধ্যসাগর। কারণ, ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করেই অতীতের মাইসেনাইয়ান, ক্রিটান, ফোয়েনিসিয়ান, লিডিয়ান, গ্রিক বা রোমানদের মতো প্রসিদ্ধ জাতিগুলো আর তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়েছিল। সেই সময়ে যারা ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে থাকত, তারা খুব সহজেই এই অঞ্চলে থাকা অন্যান্য জাতি-উপজাতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বা তথ্য বিনিময় করতে পারত। তাই এই বিশাল সমুদ্র উপত্যকা ক্রমান্বয়ে বৈচিত্র্যময় মানুষের মিলনস্থলে পরিণত হয়। সেইসঙ্গে তারা তাদের নিজেদের মতো করে কাহিনি রচনা ও প্রচার করার কারণে একটি ঘটনাবল্ল এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক উপাখ্যানও রচিত হয়। আজকের পশ্চিমা সভ্যতা মূলত সেই ইতিহাসেরই একটি পরিণতি।

এবার আপনি আরেকটি ধারার দিকে তাকান। স্থলপথই ছিল সে ধারার যোগাযোগ মাধ্যম। ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, ইরানের সুউচ্চ ভূমি, মেসোপটেমিয়া এবং মিসরের এলাকার সাথে সংযুক্ত সড়কগুলো এ যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই এলাকায় অনেক নদী আর সাগরেরও অবস্থান ছিল। যেমন : এখানে ছিল পারস্য উপসাগর, ইন্দু (সিন্ধু) ও অরক্সাস নদী, অ্যারাল ও কাস্পিয়ান সাগর, ব্ল্যাক সি, ভূমধ্যসাগর, নীল নদ এবং লোহিত সাগর। মূলত এই অঞ্চলকে ঘিরেই মুসলিম বিশ্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়। (এখানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা সাম্রাজ্য বলতে আজকের ইউরোপ এবং মধ্য পৃথিবী বলতে আজকের মুসলিম বিশ্বকে বোঝানো হয়েছে)। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুসলিম বিশ্বের এই এলাকাগুলোকে আলাদা করে কোনো নামকরণ করা হয়নি।



ভূমধ্যসাগর অঞ্চল (মেডিটেরিয়ান অঞ্চল)



ভূমধ্যসাগর অঞ্চল (মেডিটেরিয়ান অঞ্চল)

উপরোক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি অংশকে মধ্যপ্রাচ্য হিসেবে অভিহিত করা হলেও তার নামকরণের কারণটি বেশ দুর্বোধ্য। ধরুন, মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্যের মাঝখানে শুনলে সাধারণভাবে মনে হয় আপনি পশ্চিম ইউরোপের বিপরীতে কোনো স্থানে আছেন। ধরুন, আপনি পারস্য উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি এখন কোথায় আছেন? তাহলে বিশ্বের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী আপনি আসলে মধ্য পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ মজার ব্যাপার হলো জায়গাটির নাম আসলে মধ্যপ্রাচ্য। নাম নিয়ে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে আমি মধ্যপ্রাচ্য না বলে ইন্দুস বা সিন্ধু নদী থেকে শুরু করে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত গোটা এলাকাটিকে ‘মধ্য পৃথিবী’ হিসেবে অভিহিত করেছি। আমার এই নামটি দেওয়ার পেছনে যুক্তি হলো, আসলে এই এলাকাটি ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য এবং চৈনিক সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি একটি জায়গায় অবস্থিত। তাই একে মধ্য পৃথিবী বললেই বেশি যুক্তিসংগত হয়।

চৈনিক পৃথিবীর একটি আলাদা জগৎ ছিল যা ওপরোক্ত বড়ো দুই জগতের তুলনায় পুরোটাই আলাদা। চীন ভৌগোলিকভাবে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার হিসেব থেকে দূরত্বের কারণে বাদ পড়ে গেল। আর মধ্য পৃথিবী থেকে চীন আলাদা হয়ে পড়ল হিমালয়, গোবি মরুভূমি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘন বনাঞ্চলের কারণে। এসব প্রাকৃতিক সীমানা প্রাচীরের কারণেই চীন এবং তার নিকটস্থ বন্ধু বা বিদ্রোহীরা একটু দূরে দূরে থাকত। ঠিক সে কারণেই মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসে খুব একটা চৈনিক উপাদানের প্রভাব পাওয়া যায় না। তাই এই বইতেও চাইনিজদের নিয়ে কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই কম এসেছে। একইভাবে কম এসেছে সাব-সাহারা আফ্রিকানদের কথাও। সাহারা মরুভূমির কারণে এই গোটা সাব-সাহারা অঞ্চলটিও ইউরোপ বা এশিয়া থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়েই থেকেছে। আবার ভৌগোলিকভাবে ভিন্নতার কারণে আমেরিকাও মোটামুটি ইউরোপ বা এশিয়ার বলয়ের বাইরে থেকে নিজেদের মতো করে একটি পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছিল। একইসঙ্গে তারা নিজেদের মতো করে নিজস্ব একটি ইতিহাসও তৈরি করেছে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত এই ভিন্নতা চীন বা আমেরিকাকে যতই বিচ্ছিন্ন করুক না কেন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা মধ্য পৃথিবীর মধ্যে তেমন কোনো বিচ্ছিন্নতা কখনোই সৃষ্টি করতে পারেনি। এই দুটো অঞ্চল তাদের মতো করে যে দুটো পৃথক পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছিল, তার কারণ বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ফিলিপ ডি কার্টিন বলেছেন, এই দুই অঞ্চলের এই ভিন্নতার মূল কারণটি ছিল আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা। এই দুই অঞ্চল একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করার চেয়ে নিজেদের এলাকার ভেতরে যোগাযোগ রক্ষা করাটাকেই বেশি গুরুত্ব দিত। কারণ, সেটাই সহজ ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় কোনো উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগরের অন্য কোনো উপকূলের নিকটবর্তী এলাকায় যাওয়া খুবই সহজ ছিল। কিন্তু সেই তুলনায় ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে ইন্দুস (সিন্ধু) নদী তীরবর্তী এলাকায় যাওয়া ছিল বেশ কঠিন। অন্যদিকে, সেই প্রাচীনকাল থেকে মধ্য পৃথিবীতে যেই বণিকেরা আসা যাওয়া করতেন, বিশেষ করে ক্যারাভান নিয়ে যারা যাতায়াত করতেন,

তারা যেকোনো সময় যেকোনো দিকে বাঁক নিতে পারতেন। তাদের কাছে এই এলাকাটি খুবই পরিচিত ছিল। তারা সবসময় পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতেন। এই পথে যেতে যেতে যখন তারা এশিয়া মাইনর অঞ্চলের (আজকের তুরস্ক) কাছাকাছি আসতেন, তখন একটা পর্যায়ে বসফরাস প্রণালীর নিকটে এসে পথটা খুব সরু হয়ে যেত। আর এরও পরে বিশাল সাগর থাকায় তারা আর অগ্রসর না হয়ে আবার কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসতেন অথবা দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় এলাকা ধরে অগ্রসর হতেন।

সে সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন এমন ছিল যে, নতুন কোনো কিছু কেবল ব্যবসায়ী বা পর্যটকদের মাধ্যমেই মানুষের নজরে আসত। এক একটি বণিক দল শুধু যে ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে ঘুরত তা নয়; বরং তারা তাদের সাথে নানা ধরনের গাল-গল্পো, চমকপ্রদ কাহিনি, কৌতুক, গুজব, ঐতিহাসিক বর্ণনা, ধর্মীয় পুরাকীর্তিগাঁথা এবং সাংস্কৃতিক অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে চলতেন। যেন এক একটি বাণিজ্য দল এক একটি সভ্যতার বীজ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যে চিন্তা-চেতনা নিয়ে একটি জনপদে প্রবেশ করতেন, দেখা যেত তাদের প্রস্থানের পর সেসব চিন্তা-চেতনার অনেক কিছুই সেই জনপদের মানুষের স্বভাবে-আচরণে ঢুকে গেছে। এভাবে একটি লোকালয়ের সংস্কৃতি আরেকটি লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করত। সাংস্কৃতিক চেতনা বিনিময়ের কাজটিও আসলে এভাবেই সম্পন্ন হতো।

এভাবেই ভূমধ্যসাগরীয় এবং মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসগুলো রচনা হয়েছে। যারা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বসবাস করতেন। তাদের এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, তারাই আসলে মানব ইতিহাসের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন। অন্যদিকে, যারা মধ্য পৃথিবীর অধিবাসী তারাও যৌক্তিকভাবেই ভেবে নিতে পারেন যে, তারা একেবারে পৃথিবীর মূল কেন্দ্রেই থাকতে পেরেছেন।

এই দুই ভিন্ন পৃথিবীর ইতিহাস বারবার একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকে গেছে, কখনো অতিক্রম করে গেছে বেশ কিছু জায়গায়। মজার ব্যাপার হলো, আজ এত বছর পরে এসেও আমরা সেই জায়গাগুলোকেই সবচেয়ে অস্থির অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে ইজরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এই স্থানগুলোকে যদি আমরা একটু আগে বর্ণিত দুই পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব এর কিছু অংশ পড়েছে সাগর প্রধান এলাকার পূর্ব প্রান্ত জুড়ে, আর কিছু অংশ পড়েছে স্থলযোগাযোগ নেটওয়ার্কনির্ভর পৃথিবীর পশ্চিমাংশ জুড়ে। তাই ভূমধ্যসাগরীয় ইতিহাসের আঙ্গিক থেকে বিচার করলে এই জায়গাগুলো সবসময়ই তাদের একেবারে মূল শিকড়ের অংশ ছিল। আর মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখলে এই অঞ্চলগুলো তাদের। কারণ, মেসোপটেমিয়া এবং পার্সিয়ান অঞ্চলকে মধ্য পৃথিবী ঐতিহ্যগতভাবে তার নিজস্ব বলে মনে করে। সেই কারণেই এই অঞ্চলগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে আজ অবধি এই দুই পৃথিবীর কর্তব্যজিরা লড়াই করে যাচ্ছেন।

ইসলামের ছোঁয়া পাওয়ার পূর্বে মধ্য পৃথিবীর চিত্র

আদিকাল থেকে যে মানব সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল, তা মূলত সৃষ্টি হয়েছিল বড়ো বড়ো নদী বা প্লাবনকে কেন্দ্র করে। যেমন ধরা যাক, চীনের হুয়াংহো উপত্যকা, ভারতের হিন্দু নদী উপত্যকা কিংবা আফ্রিকার নীলনদ উপত্যকা। এসব স্থানে আজ থেকে ৬ হাজার বছর বা তারও পূর্ব থেকে যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা বসতি স্থাপন করেছিল, বাড়িঘর নির্মাণ করেছিল এবং এলোপাতাড়ি ঘোরাফেরা বন্ধ করে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেছিল। সভ্যতার গোড়াপত্তন কিন্তু সেখানেই।

মানব ইতিহাসে নদীকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা সভ্যতা— যাকে ইতিহাসে ‘মেসোপটেমিয়া সভ্যতা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মেসোপটেমিয়া মানে ‘নদীর মাঝখানে’। এই দুই নদীর তীরঘেঁষে যে বসতি গড়ে ওঠে, তা-ই আজকের ইরাক। সে কারণেই আমরা যখন সভ্যতার সূত্রপাত খুঁজতে যাব, তখন আমাদেরকে ইরাকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা অন্য সভ্যতাগুলো থেকে একটু এগিয়ে থাকার কারণ, এর দুই পাশে দুটো নদী ছিল। অন্য সভ্যতাগুলো সাধারণত একটি নদীকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার আরেকটি সুবিধাজনক দিক ছিল, এর নদীগুলোর তীর ছিল সমতল। তাই মানুষ এখানে আরামে ও সহজে বসত গড়তে পারত এবং যেকোনো দিক থেকে এই জায়গাগুলোতে যাতায়াত করতে পারত। আরেকটি ভালো দিক হলো, প্রকৃতি এখানকার মানুষের জন্য আলাদা করে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি। অন্যদিকে মিসরীয় সভ্যতার নীলনদের কথা একবার চিন্তা করুন। নীল নদের চারপাশে জলাভূমি বেশি ছিল।

আবার এর পশ্চিমে ছিল সাহারার মতো বিশাল একটি মরুভূমি; যা ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে খাড়া বাঁধের মতো ছিল। নীলনদকে কেন্দ্র করে মিসরীয়রা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ঠিকই; কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্য জায়গার মানুষ সেখানে কম আসতে পারত। ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দিক থেকে বিচার করলে মেসোপটেমিয়ার তুলনায় মিসরীয় সভ্যতা অনেকখানি পিছিয়ে ছিল।

মেসোপটেমিয়ার আরেকটি দিক হলো, এই সভ্যতা অনেক চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। নানা ধরনের উত্থান-পতন তাকে প্রভাবিত করেছে। প্রায় কয়েক সহস্র বছর এভাবে পার করার কারণে ভেতর থেকে কাঠামোগতভাবে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এর পাশাপাশি যাযাবরদের সাথে স্থানীয় কৃষকশ্রেণির ক্ষমতার দ্বন্দ্বও বৃহৎ মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের ভিত গড়ে দেয়।

এই সভ্যতা কীভাবে এগিয়েছে, তা ইতিহাসের আলোকে খুঁজতে গেলে যে তথ্যগুলো আমাদের সামনে আসে, সেগুলো হলো প্রথমে কৃষকেরা প্রাকৃতিক জলাধার ও নদীগুলোকে সেচ কাজের জন্য ব্যবহার করে ভালো পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। সমাজ যখন একটু একটু করে স্থিতিশীল হয়,

তখন সেখানে বেশ ভালোমানের ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার জন্ম হয়। পরে আবার এসব শ্রেণির লোকদের একটি একক ক্ষমতার আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এভাবেই সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক দলের, সেখান থেকে রাষ্ট্রের, পরিশেষে যা একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এ রকম বড়ো রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হওয়ার পর যারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকে, তারা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে। সেই সুযোগে আশেপাশের নতুন কোনো যাযাবর জাতি এসে ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা আবার তাদের মতো সাম্রাজ্য বিস্তারও করে। কয়েক বছর পরে এই যাযাবর নেতারাও আগের শাসকদের মতো আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে যায়। আবার নতুন কোনো জাতি এসে সেই সুযোগে শাসনভার দখল করে নেয়। এভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের গবেষণা থেকে জানা যায়, সে সময় সভ্যতাগুলোর বারবার ভাঙন ও গড়ে উঠার প্রক্রিয়াটি অনেকটা এরকম— শুরু হতো বিজয় দিয়ে, সেখান থেকে একত্রিতকরণ, তারপর বিস্তৃতি, এরপর ভাঙন এবং শেষমেশ আবার বিজয়। ইবনে খালদুন সভ্যতা গড়ে উঠার সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে ইতিহাসের একটি অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিহাস অনুসন্ধানে আরও দেখা যায়, সাম্রাজ্য গঠন ও পতনের এই চক্রটি একই সময়ে একাধিক সাম্রাজ্যেও ঘটেছে। ধরা যাক, একটি সাম্রাজ্য নতুন করে যখন গড়ে উঠেছিল, তখনই হয়তো আরেকটি সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার দুটো সাম্রাজ্যই হয়তো ঠিকমতো চলছিল, কিন্তু পরস্পরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় চলে গিয়েছিল। কিংবা একটি সাম্রাজ্য একটির পর একটি জায়গা দখল করে হয়তো অনেক বড়ো সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, এমন ঘটনাও ইতিহাসে অসংখ্যবার পাওয়া যায়।

প্রায় ৫ হাজার ৫শ বছর আগে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে থাকা সভ্যতাও একইভাবে একটি একক বৃহৎ সাম্রাজ্যের আওতায় এসেছিল। সে সময়ের ওই শাসনের নাম ছিল সুমের। সেই আমলেই প্রথম লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো চাকা, মালবাহী গাড়ি এবং সংখ্যার ধারণাও সে সময়েই পাওয়া যায়। এরপর আসে আক্কাদিয়দের যুগ। তারা সুমের জয় করে। আক্কাদিয়দের নেতার নাম ছিল সার্গন। ইতিহাসে সভ্যতার আদি বিজয়ী নায়ক হিসেবে তার নামটাই উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায়। সার্গন ছিল খুবই হিংস্র প্রকৃতির— যে কিনা নিজের ভালো ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। সে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে এবং সভ্যতার অনেক নিদর্শনকে ধ্বংস করে ফেলে। শুধু হত্যা বা ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হতো না। সে যে অন্যায়গুলো করত, সেগুলো আবার শক্ত মাটির ওপর খোদাই করে লিখে রাখত। তার একটি নীতি যা বহু বছর পর খোদাই করা অবস্থাতেই পাওয়া যায়, তাতে লেখা ছিল, ‘এই ব্যক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছি। আমার বিপরীতে যে-ই দাঁড়াবে, আমি তাকেই হত্যা করব’।

সার্গন তার সেনাবাহিনীকে এতটা দক্ষিণে প্রেরণ করেছিল যেন তারা সাগরের দেখা পায় এবং সেই সাগরের পানিতেই তারা নিজেদের রক্ত মাখা তরবারি ধুয়ে ফেলতে পারে। সেই পর্যন্ত পৌঁছে তিনি লিখেছিলেন, ‘যে রাজা এরপরও আমার সমকক্ষ হিসেবে দাবি করবে, তাকে এই সাগরেই যেতে হবে।’ তিনি আরও দাবি করেছিলেন, ‘আমি যতটা এলাকা জয় করেছি, এখন পর্যন্ত কেউ এত বেশি এলাকা জয় করতে বা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি।’ আজকের বাস্তবতায় অবশ্য তার এলাকা খুব বড়ো ছিল না। হয়তো পরিমাপ করলে এখনকার নিউ জার্সির তুলনায় ক্ষুদ্রই হবে।

সে সময়ই নতুন আরেক জাতি এসে আক্কাদিয়দের জয় করে। এরপর আরেক জাতি, তারপর আরেকটা। এভাবেই গুটিয়ান, ক্যাসিটেস, হুরিয়ানস এবং তারও পরে অ্যামোরীয়রা। এই ধারা যেন চলতেই থাকে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, যতই নতুন শাসকের আবির্ভাব ঘটুক না কেন, মূলত তারা একই এলাকায় শাসন চালাচ্ছিল। হয়তো আগের শাসকের তুলনায় এলাকার পরিধি একটু বাড়িয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

অ্যামোরীয়রা অন্যদের তুলনায় একটু আলাদাভাবে স্বীকৃতি পায়। কারণ, তারা ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ শহরটি নির্মাণ করেছিল এবং সেই শহর থেকেই তারা প্রথম ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাবিলনীয়দের থেকে ক্ষমতা চলে যায় অ্যাসেরীয়দের হাতে, যারা আরও বড়ো এলাকায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং নিনেভেহ-এর মতো বড়ো একটি শহরও বিনির্মাণ করেছিল। তাদের সাম্রাজ্য ছিল ইরাক থেকে শুরু করে মিসর পর্যন্ত। আর সেই আমলের কথা বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, কত বড়ো ছিল সেই সাম্রাজ্য। কারণ, তখনো পর্যন্ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার একমাত্র যানবাহন ছিল ঘোড়া। অ্যাসেরীয়রা অবশ্য ইতিহাসের পাতায় খুবই নির্মম ও স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এটা বলা কঠিন যে, সেই আমলে তারাই সবচেয়ে নির্মম জাতি ছিল কি না। তবে তারা কৌশল হিসেবে যে বর্বর নীতি গ্রহণ করেছিল, তারই ছায়া আমরা আবার দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীতে জোসেফ স্ট্যালিনের মাধ্যমে। অ্যাসেরীয়রা একটি গোটা জনগোষ্ঠীকে তাদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত করে তাদেরকে নতুন একটি জায়গায় স্থাপন করেছিল। এই উৎখাতের পেছনে যুক্তি ছিল, যদি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে তাদের ভিটেমাটি ও পরিচিত জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহলে তারা অসহায়, নেতৃত্বশূন্য ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ফলে তারা শাসকদের শত অত্যাচারের পরও তাদের বিরুদ্ধে আর বিদ্রোহ করতে পারবে না।

এই কৌশলটা সাময়িক কাজ করলেও দীর্ঘমেয়াদে সফল হয়নি। অ্যাসেরীয়রা একটা সময়ে তাদেরই অধীনস্থ ক্যালডীয়দের হাতে ধরাশায়ী হয়। তারা ব্যাবিলনকে নতুন করে নির্মাণ করে এবং এই স্থানকে ইতিহাসের একটি অনন্য সাধারণ স্থানে পরিণত করে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে মহাকাশ বিদ্যা, মেডিসিন এবং গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা ছিল। আমরা যেমন এখন ১০টি ডিজিট দিয়ে সকল হিসেব গণনা করি, তারা তখন ১২টি ডিজিট দিয়ে গণনা করত।

তারা পরিমাপ ও সময় নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিল। তাদের অবদানের কারণেই আমরা একটি বছরকে ১২ মাসে বিভক্ত করতে পেরেছি। এক ঘণ্টায় ৬০ মিনিট (যা ১২ এর ৫ গুণ) এবং এক মিনিটে ৬০ সেকেন্ড-এসব তাদেরই অবদান। তারা নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য নির্মাণে খুবই যোগ্য ছিল। ক্যালডীয় রাজাদের হাতেই ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মিত হয়, যা আজও বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

তবে এতসব গুণের বাইরে দমন-নিপীড়নের ব্যাপারে ক্যালডীয়রাও তাদের পূর্বসূরি অ্যাসিরীয়দের মতোই বর্বর নীতি অবলম্বন করেছিল। তাদের একজন রাজার নাম ছিল নেবুচাদ নেজার। তিনিই প্রথম জেরুজালেম নগরীকে ধ্বংস করে হিব্রু জনগোষ্ঠীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন। ব্যাবিলনের আরেকজন ক্যালডীয় রাজা বালশাজার। কথিত আছে যিনি কিনা একদিন নিজের প্রাসাদে খাবার খাওয়া অবস্থায় প্রাসাদের দেওয়ালে আগুনের হরফে অশরীরী হাতে একটি লেখা দেখেছিলেন।

সেখানে আদি হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল ‘মেনে মেনে টেকেল আপহারিসিন’; অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় ‘ঈশ্বর নিজ হাতে বালশাজারের রাজ্য ধ্বংস করেছেন।’ ওল্ড টেস্টামেন্টে এই লেখাকে নিয়তির অখণ্ডনীয় লিখন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বালশাজারের চাটুকারেরা যারা সবসময় তাকে ঘিরে রাখত, তারা অবশ্য এই কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝেনি। খুব সম্ভবত এর কারণ, তারা মারাত্মকভাবে মাতাল ও অন্ধবিশ্বাসী ছিল। কথাটি যে ঢং-এ লেখা, তারা সাধারণত ওই স্টাইলে কথা বলত না। তাই তারা এই কথাটির অর্থ বের করার জন্য সে সময়ের কারাগারে বন্দি হিব্রু ভাষা বিশেষজ্ঞ ডানিয়েলের শরণাপন্ন হলো। ডানিয়েল অর্থ বের করে জানালেন, ‘তোমাদের দিন শেষ। তোমাদের অন্যায় পরিমাপ করা হয়ে গেছে এবং তোমাদের দোষ প্রমাণিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই তোমাদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়বে’। ডানিয়েলের ওল্ড টেস্টামেন্ট গল্পে এভাবেই বিষয়টা উঠে এসেছে।

বালশাজারের অবশ্য এসব ভবিষ্যদ্বাণী বা সতর্কবার্তা নিয়ে পড়ে থাকার সময় বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। সে এগুলোকে পাত্তাই দেয়নি। যার ফলে কিছুদিন পরই ব্যাবিলনের ওপর দিয়ে রক্ত বন্যা বয়ে যায়। এবার পার্সিয়ান ও মেডেসদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন একটি জাতিগোষ্ঠী ব্যাবিলনকে দখল করে নেয়। এই নতুন করে উঠে আসা জাতিটি ভারতীয় ও ইউরোপীয় অঞ্চলের বংশোদ্ভূত। তারা দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে পার্সিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

এই পর্যায়ে এসে মধ্য পৃথিবীতে সাম্রাজ্য দখল বা প্রতিষ্ঠার লড়াই কিছুটা স্তিমিত হয়। যেন এক সাময়িক বিরতি। এর একটা কারণ এমন হতে পারে, পারস্য সাম্রাজ্যের আর কোনো নতুন জাতিগোষ্ঠী জয় করার বাকি ছিল না। আবার পারস্য সাম্রাজ্যকে জয়ের মতো এতটা শক্তিও কারও ছিল না। মিসর ও মেসোপটেমিয়া দুটো বৃহৎ সভ্যতাই পারস্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এর পাশাপাশি তাদের সাম্রাজ্য পশ্চিমে এশিয়া মাইনর, দক্ষিণে নীল নদ এবং পূর্বে ইরানীয় পর্বতশৃঙ্গ, আফগানিস্তান এবং ইন্দুস (সিন্দু) নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সুসভ্য এবং অভিজাত পারস্য সম্প্রদায় আর কোনো নতুন অঞ্চল জয় করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি। কারণ, ইন্দুস (সিন্দু) নদীর দক্ষিণে কালো জঙ্গল ছাড়া আর কোনো এলাকা বাকি ছিল না। আফগানিস্তানের উত্তরের আবহাওয়া ছিল খুবই বৈরী। সেখানে মানুষ বলতে তুর্কি কিছু যাযাবর ছিল, যারা চিন্তা-চেতনায় ছিল খুবই আদিম ও পশ্চাৎপদ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোনো খায়েশ পারসিয়ানদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই নতুন কোনো সীমানা না বাড়িয়ে পারসিয়ানরা নিজেদের সাম্রাজ্য মজবুত ও নিরাপদ করার দিকে মনোযোগ দেয়। তারা নতুন করে অনেকগুলো দুর্গ বানায়, যেন অন্য কোনো বর্বর জাতি সহজে তাদের এলাকায় আক্রমণ করতে না পারে। তারা নগরীর সভ্য মানুষগুলোর নিরাপত্তা এবং উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে অধিক মনযোগী ছিল।

পারসিয়ানদের মধ্যে চেতনাগত এই পরিবর্তনগুলো আসে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ শতাব্দীর দিকে। আসলে এরই মধ্যে অধিকাংশ সাম্রাজ্যগুলো একীভূত ও পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ইলাম, উর, নিনেভেহ ও ব্যাবিলনের মতো বড়ো সাম্রাজ্যগুলো একটি একক রাজধানী করে পৃথক পৃথক রাজ্য তৈরি করে ফেলেছিল এবং আশেপাশের অন্য সকল উপজাতি বা নৃগোষ্ঠীকে একটি একক শাসন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে এসেছিল। বলা বাহুল্য, পারস্যরা তাদের পূর্বসূরীদের রক্তপাত, বর্বরতা ও জবরদখলের সংস্কৃতি থেকেও যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছিল। তাই তারা পুরোনো সেই কৌশল প্রয়োগ করতে আর তেমন একটা আগ্রহী হয়নি।

এর পাশাপাশি পারস্য সাম্রাজ্যটি টিকে যাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণও ছিল। প্রথমত, পারস্যরা চিন্তা-চেতনায় অ্যাসেরীয়দের পুরোই বিপরীত ছিল। তারা শাসন কাজ পরিচালনায় অ্যাসেরীয়দের তুলনায় ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করেছিল। একটি ভিন্ন মতাবলম্বী জাতিগোষ্ঠীকে সমূলে উচ্ছেদ করার পুরোনো কৌশলে না গিয়ে পারসিয়ানরা বরং তাদের নতুন করে পুনর্বাসিত করেছিল। তারা হিব্রুদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রকাশ্য জনপদে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। পারসিয়ান শাসকরা মূলত বহু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন স্বভাব ও সংস্কৃতির মানুষরা যেন একইসঙ্গে একটি রাষ্ট্রে থাকতে পারে, তারা সেই ব্যবস্থা করেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও তারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচারাди পারসিয়ানদের শাসনামলে নির্বিঘ্নে পালন করতে পারত। এভাবে বিশাল একটি এলাকা পারসিয়ানরা সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতি জনপদে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার শাসক ছিল এবং যত ধরনের রাজস্ব ছিল, সব তারা স্থানীয় জনপদেই প্রদান করত।

সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে তাদের কাছে যে চাহিদা দেওয়া হতো, তা অতীতের তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। পরবর্তী সময়ে ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমান শাসকরা পারসিয়ানদের এসব নীতির অনেকগুলোই গ্রহণ করেছিল, যা অটোমান সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্ত নানাভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পারসিয়ানরা বুঝতে পেরেছিল তাদের রাষ্ট্রকে যদি সঠিকভাবে চালাতে হয়, সকল জনগোষ্ঠীকে যদি ভালোমতো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, একত্রে রাখতে হয়, তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। তারা রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে আমূল সংস্কার করে এবং একক মুদ্রা চালু করে। তারা উপলব্ধি করেছিল মুদ্রাই হলো বাণিজ্যিক যোগাযোগের মূল হাতিয়ার। তারা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল উন্নয়ন করে এবং সড়কের পাশে থাকার হোটেল নির্মাণ করে, যেন ভ্রমণগুলো সহজ ও আনন্দদায়ক হয়। তারা ডাক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন করে। তাদের ডাক যোগাযোগের নীতি ছিল, আজকের মার্কিন পোস্টাল সার্ভিসের মতোই কর্মতৎপর ও সেবানির্ভর। যত রাতই হোক, যত খরাপ আবহাওয়া হোক না কেন, সময়মতো গ্রাহককে তার জিনিস পৌঁছে দেওয়াটাই ছিল ডাক কর্তৃপক্ষের মূল চ্যালেঞ্জ।

পারসিয়ান কর্তৃপক্ষ অসংখ্য অনুবাদককেও নিয়োগ দিয়েছিল। এমন অবস্থা তারা তৈরি করেছিল, যেন একজন আগন্তুকও তাদের রাজ্যে এসে পারস্য ভাষা না জানার কারণে সমস্যায় না পড়ে। যেহেতু পারস্য সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ভাষার বহু লোক বসবাস করত, তাই এসব অনুবাদকরা পারস্য শাসনামলের নানা সাফল্যগাঁথাও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করত। যেন অধীনস্থ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের শাসকদের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড জানতে পারে। যেমন : পারস্য শাসক মহান দারিয়াসের কথা বলা যায়। তিনি বেহিস্তুন নামক একটি পাহাড়ে নিজের জীবনালেখ্য পুরোনো পারসিয়ান, এলামিটে এবং ব্যাবিলনিয়ান ভাষায় খোদাই করে লিখে রেখেছিলেন। একইসঙ্গে তিনি তার বিরুদ্ধে করা বিদ্রোহীদের দেওয়া শাস্তির কথাও সেখানে লিখেছিলেন, যেন ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে শাসকের সাথে অন্যায় করলে তাদের কী শাস্তি পেতে হতে পারে। তবে সার্বিকভাবে নাগরিকেরা পারস্য শাসকদের দয়ালু ও মানবতাবাদী মনে করত। কারণ, তাদের শাসকরা তাদেরকে শান্তিতে রেখেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক যাযাবর ও বখাটেরাও আজীবনে কাজ ছেড়ে সংসার পেতেছিলেন এবং কৃষিকাজের মতো উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

বেহিস্তুনে রাজা দারিয়াস যা লিখে গেছেন, তা পুরোনো পারসিয়ান ভাষায় লেখা। বর্তমান পারসিয়ান ভাষা দিয়েও তার অর্থ বের করা যায়। ১৯ শতাব্দীতে এগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর পারসিয়ান ভাষা ব্যবহার করেই অন্য দুই প্রাচীন ভাষার (এলামিটে এবং ব্যাবিলনীয়) অর্থ বের করা সম্ভব হয়। এই দুই ভাষার অর্থ জানার সাথে সাথে পুরোনো মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের একটি অজানা ভাঙার আমাদের সামনে খুলে যায়। ওই সময়ে দিনলিপি আকারে সব সংরক্ষণ রাখার বিধান ও পদ্ধতি ছিল। তাই প্রাচীন ওই ভাষাদ্বয় জানতে পারার পর থেকে আমরা এখন ইউরোপ-আমেরিকার ১২শ বছর আগের ইতিহাস জানতে পারছি, ঠিক তেমনভাবে ৩০০০ বছর পূর্বের মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কাহিনি ততটাই ভালোভাবে জানতে পেরেছি।



‘Destiny Disrupted: History Of The World Through Islamic Eyes’ বইটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক দিন সর্বাধিক বিক্রিত বই হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১০ সালে বইটি নর্থান ক্যালিফোর্নিয়া বুক অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। মূলত পশ্চিমাদের জানা ইতিহাসের বাইরে এই বইটিতে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.া.)-এর জন্মের সাল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৪শত বছরের ঘটনাবলীকে এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিমা বিকৃত ইতিহাস নয়, বরং ঘটনার শেকড়ে গিয়ে সত্যিকারের ইতিহাসকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বইটিকে ইসলামি ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়া বললেও অত্যুক্তি হবে না। বইটির পাতায় পাতায় আছে তথ্য, আছে শিহরণ জাগানো পল্ল, আছে ঘটনার সামনের ও পেছনের প্রেক্ষাপটের চমৎকার পর্যালোচনা। পাঠকেরা বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন নিঃসন্দেহে, তবে তার চেয়ে বড় কথা পাঠকবৃন্দ এই বইটি পড়ে আরও পরিণত হবেন, তাদের জ্ঞানের ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে। ইসলামের চোখে তারা ইতিহাসকে নতুন করে আবিষ্কার করবেন।



গাড়িয়ানা

শা ব দি কে শ দ
১৪, বাঙ্গাবাজার, ঢাকা-১০০০
www.gadiyana.com

ডেস্টিনী ডিসরাপ্টেড

ISBN 978-984-8754-11-0



9 789848 254110